কুরআন, মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম

আনসারী স্মারক সিরিজ

কুরআন,মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম

(অর্থাৎ মালহামা বা আরমাগেডন)

ইমরান নজর হোসেন

ইমরান এন.হোসেন প্রকাশনা

© শায়খ ইমরান নজর হোসেন,শাবান ১৪৩৯ হিজরি;২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন লেখক।

প্রকাশিত হয়েছে: ইমরান এন.হোসেন প্রকাশনা
৩,ক্যালসাইট ক্রিসেন্ট,
ইউনিয়ন হল গার্ডেন্স, স্যান
ফার্নান্ডো, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।

ইমেল:inhosein@hotmail.com
ওয়েবসাইট:www.imranhosein.org
বইয়ের দোকান:www.imranhosein.com

মুদ্রিত হয়েছে:
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ

হে মানুষ ও জিন, শিগগিরই আমি তোমাদের হিসাব–নিকাশের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করব।

সূরা আর–রহমান (৫৫:৩১)

"উক্ত আয়াতে কুরআন এমন একটি পাশ্চাত্য জগতকে উদ্দেশ্য করেছে, যা পাপে ভারাক্রান্ত; একই সাথে শায়াতীনদেরকেও (শয়তানের বহুবচন, যারা মন্দ জিন) উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা গত ৫০০ বছর ধরে বিশ্বের উপর তাদের দাম্ভিক রক্তমাখা শাসনের সময় পশ্চিমা বিশ্বকে সমর্থন ও শক্তিশালী করেছে। এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ বিশ্বজুড়ে তাদের এই পাপপূর্ণ শাসনের অবসান ঘটাবেন। নিচের আয়াতটি তাদের জানায় যে, তিনি কীভাবে তা করবেন।"

يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ ۬ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ

তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ,
তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

সূরা আর–রহমান (৫৫:৩৫)

"সূরা আর-রাহমান তাদের এ বিষয়েও সতর্ক করে যে, তাদের ক্ষেপণাস্ত্র, উপগ্রহ, ড্রোন ইত্যাদি আকাশপথে, অথবা মাটির নিচ থেকে এবং সমুদ্রের গভীরতম স্থান থেকে একমাত্র আল্লাহরই অনুমতিক্রমে উড়তে পারে। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি যেকোনো মুহূর্তে তাঁর অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারেন, এবং মহাযুদ্ধের সময় ঠিক এমনটিই ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ফেরেশতা একটি পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে, যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তীব্র গতিতে ধাবিত হচ্ছে, মাঝপথেই রুখে দিয়ে সেটিকে ঘুরিয়ে পাপপূর্ণ প্রেরণকারীর কাছেই ফেরত পাঠাতে পারে!"

“যারা আমাদের বিষ পরিবেশন করবে, শেষ পর্যন্ত তারাই তা গিলবে এবং নিজেদেরকেই বিষাক্ত করবে।”

ভ্লাদিমির পুতিন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট

“এবং পৃথিবীর রাজারা, মহৎ ব্যক্তিরা, ধনীরা, সেনাপতিরা, শক্তিশালীরা এবং প্রত্যেক দাস ও প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি নিজেদের গুহায় ও পর্বতমালার পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।”

বাইবেল ‘Revelation 6:15’

”. . . কিন্তু যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি সত্যিকারভাবে ঈমান রাখেন, তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না।”

সূচিপত্র

শব্দকোষ 7
ভূমিকা 9

১. কুরআন, মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম..10

২. পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতির একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ....12.

৩. এই প্রবন্ধ লেখার জন্য গৃহীত পদ্ধতি 14

৪. কুরআন কি নিশ্চিত করে যে এমন একটি মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘটনা পৃথিবীর শেষ হওয়ার আগে ঘটবে? 16

৫. মহাযুদ্ধের আগে একটি সতর্কতা 19

৬. কোন শহরগুলো ধ্বংস হওয়া উচিত? 20

৭. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি মহাযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা একই ধর্মীয় আহ্বানের অন্তর্গত দুটি যুদ্ধরত পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হবে 22

৮. এই দুটি খ্রিস্টান গোষ্ঠী কীভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন? 23

৯. শত শত বছরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং যুদ্ধের ইতিহাস 28

১০. নবী এবং মহাযুদ্ধ 31

১১. কুরআনে ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী: যারা ঈসা (আঃ)-কে অনুসরণ করে তাদের বিজয়, তাদের উপর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কুফর (অবিশ্বাস) করে 32

১২. কুরআন ঘোষণা করেছে যে, রুম দুবার বিজয়ী হবে 34

১৩. মহাযুদ্ধের প্রভাব ও পরিণতি 36

১৪. আশার আয়াত এবং সুরক্ষা ও পরিত্রাণের জন্য একটি প্রার্থনা 37

শব্দকোষ

আখিরুয-যামান = অন্তিমকাল। শেষ যুগ

মালহামা = নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অন্তিম কালে একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। তিনি এটিকে মালহামা বলে উল্লেখ করেছেন; খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে এটিকে আরমাগেডন বলা হয়।

হাদীস = নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বলেছেন বা করেছেন তার রেকর্ড।

মাওলানা = বর্তমানে একজন আধ্যাত্মিক গুরু বা পথপ্রদর্শকের উপাধি।

সূরাহ = কুরআনের একটি অধ্যায়।

সূরা আর-রাহমান = কুরআনের ৫৫তম সূরার নাম।

সূরা আল-ইসরা = কুরআনের ১৭তম সূরার নাম।

দারুল উলূম বা জামিয়াহ = ইসলামী উচ্চশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান।

জুলম = অবিচার, নিপীড়ন, দুষ্টতা।

জিন = আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্ট অদৃশ্য সত্তা। কিছু জিন বিশ্বাসী, অন্যেরা শয়তানকে অনুসরণ করে এবং কখনও কখনও দানব বা শয়তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

দুখান = ধোঁয়া।

হিজরত = দেশান্তর বা স্থানান্তর।

কুফর = ঐশ্বরিকভাবে প্রকাশিত সত্যকে অবিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান করা। এর অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হতে পারে।

রূম = অর্থোডক্স এবং পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে মহা বিভাজনের পূর্বে বাইজেন্টাইন খ্রিস্টান জগত।

রিবা = সুদের উপর টাকা ধার দেওয়া, অথবা প্রতারণার ভিত্তিতে লেনদেন যা মানুষকে ঠকায়।

ইয়াসরিব = মক্কার উত্তরে অবস্থিত শহর যেখানে নবী (সাঃ) হিজরত করেছিলেন। বর্তমানে এটি মদিনাতুল নবী বা নবীর শহর নামে পরিচিত।

কুরআন,মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম

(অর্থাৎ মালহামা বা আরমাগেডন)

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

"নিশ্চয়ই তাদের (ধ্বংসের) নির্ধারিত সময় সকালবেলা,
আর সকাল কি খুব কাছাকাছি নয়?"

সূরা হূদ ১১:৮১

ভূমিকা

এই পুস্তিকাটি প্রাথমিকভাবে আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দাজ্জাল দ্য ফলস মাসিহ' (দাজ্জাল মিথ্যা মসিহ) এর একটি অধ্যায় হিসেবে লেখা হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল 'ফ্রম জিসাস দ্য ট্রু মাসিহ টু দাজ্জাল দ্য ফলস মাসিহ—ইসলামী এস্কেটোলজিতে একটি যাত্রা'। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম বইটির শিরোনাম ছিল 'দাজ্জাল, কুরআন এবং আওয়ালুয-যামান' (অর্থাৎ, ইতিহাসের সূচনা)। মহাযুদ্ধ খুব শীঘ্রই শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কারণে আমি এই অধ্যায়টিকে মূল বই থেকে একটি পৃথক পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই আসন্ন মহাযুদ্ধ মানব ইতিহাসে পূর্বে ঘটে যাওয়া যেকোনো যুদ্ধের চেয়ে ভিন্ন হবে, কারণ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এই যুদ্ধে 'সোনার পাহাড়ের' জন্য যারা লড়াই করবে তাদের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনই নিহত হবে। আমরা 'সোনার পাহাড়'কে পেট্রো-ডলার আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছি এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাশিয়া বা চীন কেউই এই 'সোনার পাহাড়ের' জন্য লড়াই করবে না। অনেক পাঠকই সম্ভবত জানতে চাইবেন যে, কুরআন সেই মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কী বলেছে, তাই এই প্রবন্ধটি অবিলম্বে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ইমরান নযর হোসেন
এপ্রিল ২০১৮, ত্রিনিদাদ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে

ভূমিকা

কুরআন সূরা আন-নাহল: ১৬:৮৯ আয়াতে ঘোষণা করেছে যে, "এটি সবকিছু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে"; এর মানে হলো, এটি কেবল ইতিহাসের গতিপথ বা প্রক্রিয়াকেই নয়, বরং মানবজাতি এই মুহূর্তে ইতিহাসের যে পর্যায়ে আছে, সেটিও ব্যাখ্যা করতে পারে। এই প্রবন্ধটি সেই দাবির সত্যতার চমকপ্রদ প্রমাণ তুলে ধরবে। কুরআন নিয়ে আমাদের গবেষণা দেখাচ্ছে যে, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার পাঁচশ বছরের রক্তমাখা শাসন এখন শেষ হতে চলেছে। আর অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, যার জন্য পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্ব এবং তাদের ইহুদিবাদী মিত্ররা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সেটাই হবে এই শাসনের শেষের শুরু। কুরআন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীটা এমন হবে যেখানে ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীরা—যাদের বেশিরভাগই অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী—তাদের পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর আল্লাহর নির্দেশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। আর তাদের এই পাপী ও ধর্মহীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর এই আধিপত্য পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত বজায় থাকবে।

কুরআন আরও ঘোষণা করেছে যে, এমন এক খ্রিস্টান সম্প্রদায় থাকবে যারা মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হবে। এই ঘোষণার মাধ্যমে মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীর কাছে সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যার দ্বারা আখিরুয-যামানে অর্থাৎ কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ঈসা (আঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারীদের চেনা যাবে।

"আমরা এখন এক অদ্ভুত সময়ে বাস করছি, যখন সত্যিকারের মুসলিম ও সত্যিকারের খ্রিস্টানদের পাশাপাশি সেই সাহসী ইহুদিরাও, যারা ইসরাইলের জায়নবাদী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে, এমনভাবে নির্যাতিত হচ্ছে যে তারা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়া এবং বিশ্বের আরও অনেক জায়গার অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা একসময় উসমানীয় তথাকথিত ইসলামী সাম্রাজ্য এবং পশ্চিমা খ্রিস্টানদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া অবিরাম অন্যায় যুদ্ধের কারণে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেছে। এরপর তারা ইহুদি-পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট বলশেভিক বিপ্লবের নিপীড়নের শিকার হয়, যা রাশিয়ায় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, কমিউনিজম নিয়ে আসে এবং ফলস্বরূপ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ধ্বংস করার জন্য অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের উপর এক দীর্ঘ, অন্ধকার নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েত যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

সেই ভয়ংকর নাস্তিক সোভিয়েত আলিঙ্গন থেকে অলৌকিকভাবে বেরিয়ে এসে এবং নিজেদের রক্ষা করার জন্য সামরিক শক্তি ফিরে পেয়েও, এখন তারা পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্বের দ্বারা

পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকির মুখে পড়েছে। এই পশ্চিমা বিশ্ব তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যাদের শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।"

"এই প্রবন্ধটি এই আশা জাগাচ্ছে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে আর বেশিদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

দাজ্জাল মিথ্যা মসিহ সম্পর্কিত আমাদের আসন্ন দ্বিতীয় বইটি আরও অনেক প্রমাণ দেবে যে, এই মহাযুদ্ধ সত্য মসিহ ঈসা (আঃ)-এর এই পৃথিবীতে দ্রুত ফিরে আসার পথ তৈরি করবে। এর পর পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের জন্য সূর্য আরও উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেবে।

আমরা ভাবতেও পারি না যে মানবজাতি শীঘ্রই সংঘটিত হতে যাওয়া এই মহাযুদ্ধের মতো ভয়ঙ্কর আর কোনো যুদ্ধের মুখোমুখি হবে। তাই এই প্রবন্ধে আসন্ন মহাযুদ্ধকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীকৃত মালহামা বা আরমাগেডন হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

যদি প্রত্যাশিতভাবে, এই মহাযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তবে এমন যুদ্ধ মানব ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ঘটনা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এমন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মুহূর্তে মারা যাবে এবং অসংখ্য শহর ও নগর নিমেষেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও কুরআনের আয়াতগুলো (নিচে দেওয়া হলো) সেই মহাযুদ্ধের ঘটনাকে সরাসরি নির্দেশ নাও করতে পারে, তবে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা মহাযুদ্ধ শুরু হলে কী ঘটতে পারে তা বুঝতে বেশ সহায়ক হবে:

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

তা ছিল শুধুই একটি বিকট আওয়াজ, ফলে তারা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

সূরা ইয়াসীন ৩৬:২৯

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ

নিশ্চয় আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম এক বিকট আওয়াজ, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর খন্ডিত শুষ্ক খড়ের মত হয়ে গেল।

সূরা আল-কামার ৫৪:৩১

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই আরও অনেকে মারা যেতে পারে পানীয় জল বা খাবারের অভাবে, অথবা বিশেষ করে মেগাসিটিগুলোতে নেমে আসা সহিংসতা ও নৈরাজ্যের

কারণে, যখন মরিয়া মানুষ খাদ্য বা জলের জন্য একে অপরের উপর আক্রমণ চালাবে। পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া মাশরুম আকৃতির মেঘের আকারে—আকাশ ছেয়ে ফেললে, তা সূর্যালোক এবং ফলস্বরূপ তাপকে আটকে দেবে; এর ফলে পৃথিবীর সেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অংশ তীব্র ঠাণ্ডায় আচ্ছন্ন হতে পারে এবং এর কারণেও আরও অনেকে মারা যেতে পারে। এবং সবশেষে, পারমাণবিক যুদ্ধের জৈবিক ও অন্যান্য প্রভাবে আরও বেশি মানুষ মারা যেতে পারে।

তবে, পবিত্র কুরআনের সূরা আর-রাহমান আমাদেরকে এই প্রত্যাশা করার সুযোগ দেয় যে, সেদিন সব পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উড়বে না এবং সব ক্ষেপণাস্ত্র তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবেও না, কারণ শত্রুরা তাদের পরিকল্পনা করে, আর আল্লাহ ও তাঁর পরিকল্পনা করেন।

পারমাণবিক যুদ্ধের কিছু পরিণতির সারাংশ নিচে দেওয়া হলো। সারাংশটি http://www.nucleardarkness.org ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। যদিও নিচে দেওয়া কিছু মতামতের বৈজ্ঞানিক বা শাস্ত্রীয় সমর্থন নাও থাকতে পারে, তবুও আমরা আমাদের পাঠকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, জাপানের দুটি শহরে পাপপূর্ণ অত্যাচারীদের দ্বারা নিক্ষেপ করা দুটি পারমাণবিক বোমা ছাড়া এমন কোনো পূর্ববর্তী ঘটনা নেই যা দিয়ে আমরা মহাযুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু অনুমান করতে পারি।"

পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতির একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার পারমাণবিক যুদ্ধ ১৫০ মিলিয়ন টন ধোঁয়া তৈরি করবে:

উচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকা ২৬০০ মার্কিন ও রাশিয়ান কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র (২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুতে (এবং সম্ভবত কৌশলগত গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতেও) নিক্ষেপ করা হবে।

অবশিষ্ট ৭৬০০ টি মোতায়েনকৃত ও কার্যকরী মার্কিন ও রাশিয়ান কৌশলগত পারমাণবিক ওয়ারহেড/অস্ত্রের কিছু অংশ প্রাথমিক হামলার প্রতিশোধ হিসেবে নিক্ষেপ ও বিস্ফোরিত করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং রাশিয়ার শত শত বড় শহর বিশাল অগ্নিকাণ্ডে নিমজ্জিত হবে, যা কয়েক হাজার বা লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল/কিলোমিটার শহরাঞ্চল পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

পারমাণবিক অগ্নিকাণ্ড থেকে সৃষ্ট ১৫০ মিলিয়ন টন ধোঁয়া মেঘের স্তর ভেদ করে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে উঠে যাবে, যেখানে এটি দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একটি ঘন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক মেঘের স্তর তৈরি করবে। এই ধোঁয়া সূর্যালোককে আটকে দিতে এবং শোষণ করতে বহু বছর ধরে সেখানে অবস্থান করবে।

এই ধোঁয়া উত্তর গোলার্ধে পৃথিবীর পৃষ্ঠে সূর্যালোক পৌঁছানো ৭০% পর্যন্ত আটকে দেবে এবং দক্ষিণ গোলার্ধেও ৩৫% পর্যন্ত সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত হবে। উষ্ণ সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১৮,০০০ বছর আগে শেষ বরফ যুগের উচ্চতার চেয়েও শীতল বা তার চেয়েও বেশি শীতল হয়ে পড়বে।

উত্তর আমেরিকার বিশাল অঞ্চলজুড়ে ২০° C এর বেশি এবং ইউরেশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলজুড়ে, যার মধ্যে সমস্ত কৃষি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত, ৩০° C এর বেশি দ্রুত তাপমাত্রা হ্রাস পাবে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ১৫০ মিলিয়ন টন ধোঁয়ার কারণে উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তম কৃষি অঞ্চলগুলিতে সর্বনিম্ন দৈনিক তাপমাত্রা ১ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাবে। প্রতি রাতে মারাত্মক তুষারপাত হবে এবং খাদ্য উৎপাদন অসম্ভব করে তুলবে। দীর্ঘস্থায়ী শীতের কারণে গড় বৈশ্বিক বৃষ্টিপাত ৪৫% কমে যাবে। বহু বছর ধরে ফসল ফলানোর ঋতু কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সুরক্ষামূলক ওজোন স্তরের ব্যাপক বিনাশও ঘটবে, যার ফলে অত্যন্ত তীব্র মাত্রার বিপজ্জনক অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছাবে।

বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ উৎপন্ন হবে এবং স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। পারমাণবিক চুল্লিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করলে দীর্ঘস্থায়ী আইসোটোপের বিকিরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আগুন থেকে বিষাক্ত ধোঁয়ার বিশাল মেঘ মাটিকে জড়িয়ে ধরে নির্গত হবে; বিপুল পরিমাণ শিল্প রাসায়নিকও পরিবেশে প্রবেশ করবে।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের মাত্রা এবং গতির চরম পরিবর্তন, সেই সাথে অতিবেগুনি রশ্মির ব্যাপক বৃদ্ধি, বিশাল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং বিষাক্ত ও শিল্প রাসায়নিকের ব্যাপক নির্গমনের কারণে অনেক জীবের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যে চাপের মুখে থাকা স্থলজ ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ধসে পড়বে। খাদ্য উৎপাদন করতে না পেরে অধিকাংশ মানুষ অনাহারে মারা যাবে।

৬৫ মিলিয়ন বছর আগে যা ঘটেছিল, যখন একটি বিশাল গ্রহাণুর আঘাতে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছিল (৭৫% প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছিল, যার মধ্যে ২৫ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের সমস্ত প্রাণী অন্তর্ভুক্ত), তেমনই একটি গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটবে।

এমনকি খাদ্য, জল, শক্তি এবং চিকিৎসা সরঞ্জামসহ বহু বছরের রসদ মজুদ করে আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসকারী মানুষের পক্ষেও যুদ্ধ-পরবর্তী প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা সম্ভবত সম্ভব হবে না।"

উপরে যা অনুমান করা হয়েছে, তার সামান্য অংশও যদি ঘটে, তবে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। যেহেতু কুরআন ঘোষণা করেছে যে"এটি সবকিছু ব্যাখ্যা করে", তাই এটি অসম্ভব যে কুরআন সেই মহাযুদ্ধ এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে না। এই প্রবন্ধটি সেই মহাযুদ্ধের বিষয়ে কুরআনের ঐশ্বরিক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের প্রয়াসমাত্র।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে

আমাদের প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, যেগুলো আমরা মহাযুদ্ধ (আল-মালহামা আল-কুবরা) বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করি। আমরা এই বিষয়ে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসসমূহকে কেবলমাত্র সেই পরিমাণে ব্যবহার করেছি, যতটুকু কুরআনে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ব্যাখ্যা করতে বা পরিপূরক করতে প্রয়োজন হয়েছে। কুরআনই আমাদের মূল ও চূড়ান্ত মানদণ্ড, এবং অন্যান্য উৎস কেবল এর ব্যাখ্যামূলক সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমাদের দাবিটি স্মরণ করিয়ে দিতে হয় সেই সমালোচকদের প্রতি, যারা চেচনিয়া, ইরাক, সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানে তাদের ভুয়া জিহাদ' বাস্তবায়নের জন্য সান্তা ক্লজ থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র (কখনো কখনো রসায়নিকসহ) ও মার্কিন ডলার গ্রহণ করে আসছে এরূপ কার্যকলাপ কোনো অবস্থাতেই হাদীসকে কুরআনে প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিকল্প বা প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

যদিও আমরা স্বীকার করি যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ কিংবা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসসমূহের এমন বহু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থাকতে পারে, যা এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত ব্যাখ্যার সাথে ভিন্ন হতে পারে, তবুও আমরা পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে

চাই যে—কোনো ব্যাখ্যা সঠিক না ভুল তা নির্ধারণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট, পদ্ধতিগত মানদণ্ড অনুসরণ করা আবশ্যক।

আমরা এই সঠিক পদ্ধতি শিখেছি আমাদের শিক্ষক, ইসলামের বিশিষ্ট পণ্ডিত **মাওলানা ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (১৯১৪–১৯৭৪)**-এর কাছ থেকে। তিনি তাঁর দুই খণ্ডে রচিত সুবিশাল গ্রন্থ *"The Qur'ānic Foundations and Structure of Muslim Society"* (World Federation of Islamic Missions, Karachi, 1973)-এ সেই ব্যাখ্যাগত পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, যা ইসলামী চিন্তা ও সমাজ গঠনের কুরআনভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

সঠিক পদ্ধতি অনুসারে, একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের সকল আয়াতকে একত্রিত করে একটি সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করতে হবে, যাতে ঐ বিষয়ের ঐশ্বরিক অর্থব্যবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যখন কুরআনের এই অর্থব্যবস্থা সনাক্ত করা হয়, তখন তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল হাদীসের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। কোনো হাদীস কুরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হলে, তাকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং কুরআন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে একীভূত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যভাণ্ডার ক্রমাগত প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়।

কুরআন বা হাদীসের কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে পূর্ব-পরিকল্পিত কোনো উদ্দেশ্য, কোনো বিশেষ মতবাদ, গোষ্ঠী বা পণ্ডিতের প্রতি আনুগত্য নয়; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত সেই বিষয়ের সুসংহত তথ্যভাণ্ডার। আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত *'Methodology for Study of the Qur'ān'* গ্রন্থে এই সঠিক পদ্ধতি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

এই প্রবন্ধে আমরা কুরআনের আরবি পাঠকে অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করিনি, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে কুরআন নিজেই অলৌকিক এবং তাই এটিকে সম্পূর্ণরূপে অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়। বরং, আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেছি, সেগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

সবশেষে, আমাদের ইসলামী এসকাটোলজিক্যাল (আখিরুযযামান) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, মহাযুদ্ধ বা *মালহামা* যে কোনো সময় শুরু হতে পারে। প্রচলিত বিশেষজ্ঞ মতামত হলো, যখন এটি সংঘটিত হবে, তখন এতে পারমাণবিক অস্ত্র এবং অন্যান্য ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, এবং তাই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমাদের পাঠকদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না সেই ঘটনাগুলোর প্রমাণ দেখার জন্য, যা এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতসমূহের বিশ্লেষণের সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণ করবে।

যদি আমরা পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি, তবে যারা এই প্রবন্ধকে অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অন্যদেরও একইভাবে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করবে, তারা জ্ঞান ও সত্যের সঙ্গে এক অদ্ভুত ও সন্দেহজনক মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

কুরআন কি নিশ্চিত করে যে, পৃথিবীর শেষের আগেই এমন একটি মহাপ্রলয়কর ঘটনা সংঘটিত হবে ?

কুরআন সত্যিই এমন একটি ঘটনার কথা নিশ্চিত করে যা পৃথিবীর শেষের আগে সংঘটিত হবে, যেখানে সর্বোচ্চ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে কোনো শহর বা নগর ধ্বংস থেকে বাঁচবে না, এবং যে শহরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না সেগুলো মারাত্মক শাস্তি ভোগ করবে।

وَ اِنۡ مِّنۡ قَرۡیَۃٍ اِلَّا نَحۡنُ مُہۡلِکُوۡہَا قَبۡلَ یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ اَوۡ مُعَذِّبُوۡہَا عَذَابًا شَدِیۡدًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا

এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাত দিনের পূর্বে ধ্বংস করবনা অথবা কঠোর শাস্তি দিবনা; এটাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

সুরা আল ইসরা, 17:58

কুরআনের নির্দেশাবলী অনুসারে, যখন জুলুম অর্থাৎ অন্যায়, পাপ ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে প্রাধান্য পায়, তখন কোনো জনপদ বা নগর ঐশ্বরিক ধ্বংসের লক্ষ্যে নির্ধারিত হয় সেই সময় তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তাদের ধ্বংসের সময় নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

وَ تِلۡکَ الۡقُرٰۤی اَہۡلَکۡنٰہُمۡ لَمَّا ظَلَمُوۡا وَ جَعَلۡنَا لِمَہۡلِکِہِمۡ مَّوۡعِدًا

আর এগুলো সেই জনপদ যেগুলো আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলম করেছে এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছি।

সূরা আল–কাহফ আয়াত, ৫৯

কুরআন আমাদের আরও জানায় যে, একদিন পৃথিবী শুষ্ক ধুলোয় পরিণত হবে; তখন এটি এমন একটি পৃথিবী হবে যেখানে কোনো সবুজ থাকবে না, কিছুই জন্মাবে না, এবং কোনো খাদ্যও থাকবে না।

اِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَی الۡاَرۡضِ زِیۡنَۃً لَّہَا لِنَبۡلُوَہُمۡ اَیُّہُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا

وَ اِنَّا لَجٰعِلُوۡنَ مَا عَلَیۡہَا صَعِیۡدًا جُرُزًا

নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।
আমি অবশ্যই তার উপর যা আছে তা বৃক্ষলতাহীন শুকনো ধূলা মাটিতে পরিণত করব।

সূরা আলকাহফ ১৮:৭-৮

যেহেতু পরম আল্লাহ কখনো অন্যায় করেন না, তিনি কোনো জনপদকে ধ্বংস করবেন না যদি সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য না হয়। অতএব, কুরআনের উপরে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী (সূরা আল ইসরা, ১৭:৫৮) ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট করতে হবে যে—যে কোনো শহর বা জনপদ যদি ধ্বংসের যোগ্য বিবেচিত হয়, তবে সে তার ওই ভাগ্য থেকে রক্ষা পাবে না। এই ধরনের সকল ধ্বংসকাণ্ড কিয়ামাতের পূর্বে সংঘটিত হবে; এবং যদি কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য শহর রক্ষা পায়, তবে সে বিকল্পভাবে তীব্র ঐশ্বরিক শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর মহান আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীকে অনুর্বর ধুলোয় পরিণত করবেন না, কারণ এর ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে; বরং, পৃথিবীর সেই অংশই অনুর্বর ধুলোয় পরিণত হবে যার অধিবাসীদের ধ্বংস করা হবে, অর্থাৎ মহাযুদ্ধের পর!

কুরআন শুধু একটি মহাপ্রলয়কর ঘটনারই নিশ্চিত করে না (উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে) যা প্রতিটি শহর বা জনপদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবে যা ধ্বংসের যোগ্য, বরং এটি এমন একটি ঘটনারও বর্ণনা করে যা আখিরুজ্জামান বা শেষ সময়ের একটি প্রধান নিদর্শন, যেখানে আকাশ দুখান বা ধোঁয়ায় ভরে যাবে:

فَارۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَاۡتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيۡنٍ

অতএব অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ।

সূরাঃ আদ-দুখান ৪৪:১০

এমনকি কুরআন আমাদের আরও জানায় যে, একটি আগুনের ঝলকানি ঘটবে, যার পরে ধোঁয়া আকাশ পূর্ণ করবে:

يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ

তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ,
তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

সূরা আর-রহমান (৫৫:৩৫)

তোমাদের উভয়ের উপর পাঠানো হবে আগুনের শিখা এবং পিতলের ঝলকানি, তখন তোমরা তা থেকে রক্ষা পাবে না। **(পিকথল)**

তোমাদের উপর আগুনের ঝলকানি নিক্ষেপ করা হবে, এবং ধোঁয়া, আর তোমরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না! **(আসাদ)**

তিনি তোমাদেরকে একটি তীব্র শিখা এবং জ্বলন্ত ধোঁয়া দ্বারা তাড়া করবেন, আর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। **(আয়েশা বিউলি)**

তোমাদের উভয়ের উপর আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া পাঠানো হবে, আর তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। **(মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদি)**

আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, উপরের আয়াতটি ব্যাখ্যা করার সময় কেবল পিকথলই কুরআনের আরবি পাঠের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন বলে মনে হয়। তিনি সঠিকভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আগুনের শিখা দুটি লক্ষ্যবস্তুর উপর বর্ষিত হবে। এটা খুবই স্পষ্ট যে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে সেইসব মানুষ যাদের অসৎ কাজে দুষ্ট জিনেরা সমর্থন করত, এবং এই আক্রমণের ফলে দুষ্ট মানুষ ও তাদের দুষ্ট জিন সমর্থকদের সেই জোটের ধ্বংস হবে।

এই প্রবন্ধটি কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোকে মহাযুদ্ধের বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এবং এর ফলস্বরূপ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সেই যুদ্ধে এক পক্ষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে এবং অপর পক্ষকে পরাজিত করা হবে। সাধারণত এই সাহায্য ফেরেশতাদের মাধ্যমেই এসে থাকে। আল্লাহ চাইলে মহাযুদ্ধকে ব্যবহার করে একটি দুষ্ট জাতিকে এমনভাবে শাস্তি দেবেন যে তারা আর রক্ষা পাবে না। যে জাতি শাস্তি পাবে, তারা এমন হবে যাদের মন্দ কাজগুলোতে দুষ্ট জিনেরা সাহায্য করে। কুরআন শুধু এই মানুষ - জিন জোটের কথা বলে না, বরং সতর্কও করে যে এক দিন তাদের উভয়কেই তাদের বিশাল পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ

হে মানুষ ও জিন, শিগগিরই আমি তোমাদের হিসাব-নিকাশের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করব।

সূরা আর-রহমান (৫৫:৩১)

আমরা আমাদের সমালোচকদের সেই শেষকালের ধোঁয়া (কুরআন, আল-দুখান ৪৪:১০) এবং শেষকালের আগুন (কুরআন, আর-রহমান ৫৫:৩৫) অন্য কোথাও চিহ্নিত করার অধিকার

স্বীকার করি, এই লেখক তা চিহ্নিত করছেন সেই ঘটনার মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করবে প্রতিটি শহর বা নগরের ধ্বংস—অতএব এটি হবে সেই ধোঁয়া যা বিস্ফোরিত পারমাণবিক অস্ত্রের আগুনের ঝলকের পরে উঠবে। এই ধোঁয়াটিকে কবিতাময়ভাবে মাশরুম ক্লাউড বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কবিতার ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক করবে শুধুমাত্র স্কুলছাত্ররাই।

মহাযুদ্ধের পূর্বে এক সতর্কবার্তা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ন্যায়পরায়ণ এক ঈশ্বর, এবং তাঁর এই ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের নীতির ফলস্বরূপ তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কখনো কোনো জাতিকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ না তাদের কাছে আগে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়।

وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا....

আমরা কখনো কোনো জাতিকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না আমরা তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করি সতর্ক করার জন্য।

সূরা আল-ইসরা আয়াত ১৫

যেহেতু নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে তিনি সর্বশেষ নবী, এবং কুরআন সর্বশেষ গ্রন্থ, তাই একজন মুসলিম, যিনি নবীর অনুসারী, আশা করতে পারেন না যে এখন আর কোনো রাসূল পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, যিনি মহাযুদ্ধে ঘটতে যাওয়া ধ্বংস ও ভয়ানক শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করবেন।

এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে কুরআনের মূল কাজ হলো সেই সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া, যা মহান আল্লাহ্ আগেই ঘোষণা করেছেন—যা মহাযুদ্ধের পূর্বে মানুষকে সতর্ক করবে।

যদি আমাদের মতামত সঠিক হয়, তবে এই প্রবন্ধ এবং একই বিষয় নিয়ে অন্যান্য শিক্ষাবিদদের লেখা প্রবন্ধগুলো বিশেষ গুরুত্ব ধারণ করে। এজন্য এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন, যাতে কুরআনের সতর্কবার্তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়।

এই সতর্কবার্তাটি সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে আমাদের জানা প্রয়োজন কোন কোন শহর-নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেইসব শহরে বসবাসকারী এবং সেখানে চলমান অশ্লীলতা, অন্যায় ও অধর্মকে প্রত্যাখ্যান করা লোকেরা দুইটি পথের মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিতে হবে — বা তারা তাদের শহরের দুষ্কর্মের চেহারা বদলাবে, নতুবা হিজরত করবে; অর্থাৎ অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে নিরাপদ জীবন গড়বে।

কোন শহরগুলো ধ্বংসের যোগ্য?

যখন মহান আল্লাহ সমকামিতার মতো যৌন বিকৃতির কারণে সদোম ও গোমোরাহকে ধ্বংস (লুত (আঃ) এর জনগণ,) করেছিলেন, তখন তিনি একটি সতর্কবার্তা রেখে গেছেন যে, যারা আবার এই ধরনের যৌন বিকৃতি গ্রহণ করবে, তাদের ধ্বংস করার জন্য তিনি তার শাস্তি নিয়ে ফিরে আসবেন। কেবল বধির, মূক ও অন্ধরাই এটা বুঝতে ব্যর্থ হবে যে, আধুনিক পশ্চিমে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে, যারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা সক্রিয়ভাবে একজন পুরুষ ও অন্য একজন পুরুষের মধ্যে এবং একজন নারী ও অন্য একজন নারীর মধ্যে বিবাহের বৈধকরণের প্রচার করছে। এর অর্থ হলো, আধুনিক পশ্চিমের সমস্ত শহর ও জনপদ ঐশ্বরিক ধ্বংসের যোগ্য, কারণ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, যারা এই যৌন বিকৃতির এজেন্ডা গ্রহণ ও প্রচার করবে, তিনি তাদের সকলকে আবার ধ্বংস করবেন।

কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ যখন হযরত লুত (আঃ) এর জাতির শহর ধ্বংস করতে চাইলেন, তার আগে তিনি একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ

তোমাদের মধ্যে কি ভাল মানুষ একটিও নেই?

সূরাঃ হূদ আয়াত ৭৮

এই প্রশ্নটি শুধু তাদের জন্যই ছিল না যারা সমকামিতার মতো যৌন বিকৃতিতে লিপ্ত ছিল, বরং তাদের জন্যও ছিল যারা নীরবে এই প্রথাকে মেনে নিয়েছিল কখনও এর প্রতিবাদ বা নিন্দা করেনি।

যখন আল্লাহ তায়ালা সমকামিতার এই বিকৃত আচরণের কারণে সদোম ও গোমোরাহ (লুত (আঃ) এর জনগণ,) নগরীগুলো ধ্বংস করেছিলেন, তখন কুরআন সতর্ক করেছিল যে এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট নিদর্শন ও সতর্কবার্তা।

اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ

"নিশ্চয় এতে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না।"
সূরা. আশ-শু'আরা, আয়াত *১৭৪*

নিশ্চয়ই এই ঐশ্বরিক শাস্তির ঘটনায় এক গভীর নিদর্শন রয়েছে;
কিন্তু মানুষের অধিকাংশই সেই নিদর্শনে বিশ্বাস করে না
যে, যদি মানবসমাজ আবার সেই যৌন বিকৃতি ও পাপাচারে ফিরে যায়,
তবে আল্লাহ তায়ালা পুনরায় তাঁর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন।

আমাদের প্রথম ইসলামিক এসক্যাটোলজিকাল (শেষ জামানার) উপসংহার হলো আসন্ন মহাযুদ্ধ এমনভাবে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে ধ্বংস করবে যে, এই মহাযুদ্ধের পর যা কিছু পশ্চিমের অবশিষ্ট থাকবে, তা বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না।

কুরআন আরও সতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল (সা.) সেই সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন যে রিবাতে (সুদভিত্তিক লেনদেনে) জড়িত।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوۡا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا فَاۡذَنُوۡا بِحَرۡبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ ۚ وَ اِنۡ تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ ۚ لَا تَظۡلِمُوۡنَ وَ لَا تُظۡلَمُوۡنَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বাকী সূদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।

সূরা আল-বাকারার ২৭৮-৯

এই ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছিল যখন মুসলমানরা অর্থনীতি থেকে রিবা (সুদ) নির্মূল করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু সূরা আল-ইসরা-তে যে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, তা হল যখনই ইতিহাসে রিবা তার রক্তমাখা মাথা তুলবে, তখনই তিনি আবার তা করবেন। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা রিবা দ্বারা ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও একটি মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির রক্ত পান করে মোটা হয়েছে যা রিবার উপর নির্মিত। তাই আল্লাহর যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ তায়ালা আসন্ন মহাযুদ্ধে প্রবেশ করবেন সেইসব বিশ্বাসীদের সমর্থন করতে, যারা সুদী পশ্চিমা অর্থনীতির শিকার, যাতে যারা রিবা ব্যবহার করে বিশ্বের সম্পদের উপর অন্যায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের শাস্তি দিতে পারেন। এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধেই তিনি ইতিমধ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং তারা শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখবে!

অবশেষে আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন এবং তার জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন, কারণ ফেরাউন ছিল ধর্মহীন এবং সে ইসরায়েলের বিশ্বাসী লোকদের উপর অত্যাচার করত। যখন ফেরাউন ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে বুঝতে পারল যে সে আসলে কোনো খোদা নয়, এবং সে ভুল পথে ছিল। এরপর সে ইসরায়েলীয়দের প্রভুর উপর তার বিশ্বাস ঘোষণা করল। তখন আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ফেরাউনের দেহ সংরক্ষণ করবেন, যাতে ভবিষ্যতে যারা আসবে, তাদের জন্য এটি একটি নিদর্শন হতে পারে। এই নিদর্শনের অর্থ ছিল, যদি তারাও ফেরাউনের মতো অন্যায়-অবিচার

করে, তাহলে তাদেরও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে, যা ফেরাউন ও তার জাতির হয়েছিল।
ফেরাউনের দেহ এমন এক সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল, যখন ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে আনুষ্ঠানিকভাবে জায়নবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আর সেই সময় থেকেই ইতিহাসের পাতায় সেই বিশাল সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তির দিন গোনা শুরু হয়, যার চূড়ান্ত ফল ছিল দুষ্টদের আল্লাহর তরফ থেকে ধ্বংস।

কোরআন ঘোষণা করেছে যে এমন দুষ্টতার ফলস্বরূপ ঐশ্বরিক ধ্বংস আসবে, এবং এই ধরনের ঐশ্বরিক শাস্তির মুহূর্ত নির্ধারিত। এই প্রবন্ধটি প্রস্তাব করে যে বিশ্বের দুষ্ট, ধর্মহীন পশ্চিমা শাসকদের জন্য সময় শেষ হয়ে গেছে, এবং তাদের ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত ধ্বংসের সময় এখন মহাযুদ্ধের সাথে স্থির হয়েছে।

মুহাম্মদ (সা.) পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা হবে দুই পক্ষের মধ্যে দুই পক্ষই একই ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী।

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে এটিও ছিল: কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দুটি বৃহৎ যুদ্ধরত দল একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং তাদের মধ্যে এক বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটবে, অথচ তাদের উভয়ের দাবি (ধর্মীয় বিশ্বাস) একই হবে।'"

সহীহ বুখারী

আমরা এমন একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি যা একটি অনস্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য: শীঘ্রই একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা প্রধানত দুটি বিরোধী শক্তির মধ্যে হবে এবং উভয়ই খ্রিস্টান ধর্মবলম্বী। আমাদের সমালোচকরা অবশ্যই আমাদের এ মতের সঙ্গে একমত হবেন না; তারা প্রায়শই ভিন্নমত পোষণ করেন।

রাশিয়া, যা আসন্ন যুদ্ধের এক পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছে, এটি একটি অর্থোডক্স খ্রিস্টান দেশ এবং সম্প্রতি এটি নাস্তিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিষাক্ত প্রভাব থেকে সফলভাবে মুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিমা খ্রিস্টান শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছে, এবং যিনি শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছেন এবং পুনরায় তেমন একটি সংঘাতের জন্য আগ্রহী, সেটিও একটি খ্রিস্টান দেশ যদিও এটি অর্থোডক্স নয়, বরং পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্ম মেনে চলে।

এই দুটি খ্রিস্টান গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যগুলি কী কী?

দুই বিরোধী খ্রিস্টান শিবিরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, এবং যারা কোরআন থেকে এই বিষয়ে দিকনির্দেশনা খুঁজছেন তাদের জন্য এই পার্থক্যগুলো অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোরআন দুটি ভিন্ন ধরনের খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য নির্দেশ করেছে। কোরআন অনুসারে, এমন খ্রিস্টানরা থাকবে যারা মুসলমানদের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসায় সবচেয়ে কাছাকাছি হবে থাকবে (সূরা মায়েদা, ৫:৮২)। এই ধরনের খ্রিস্টানরা কেবল কোরআন নাজিলের সময়ই উপস্থিত ছিলেন না, ভবিষ্যতেও থাকবে।

আফ্রিকার আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা সেই মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ দেখিয়েছিলেন, যারা মক্কার মুশরিকদের হাতে দাস ও অর্ধ-দাস ছিলেন এবং ইসলামে নিপীড়ন ও যুদ্ধ থেকে বাঁচতে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় চেয়েছিলেন। রাজা মক্কার পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মুসলিমদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তারা যতদিন ইচ্ছা খ্রিস্টান আবিসিনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করতে পারবেন। তিনি ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন এবং ইসলামের ধর্ সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য করেছিলেন।

যখন খবর এলো যে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা মৃত্যুবরণ করেছেন,তখন নবী মুহাম্মদ (সা.) ইয়াছরিবে (বর্তমান মদিনাতুন নবী) তার জন্য জানাজার নামাজ আদায় করেছিলেন।

কিন্তু কোরআন অন্য ধরনের খ্রিস্টানদেরও স্বীকৃতি দিয়েছে, যারা পূর্বে উল্লেখিত মুসলিম-বান্ধব খ্রিস্টানদের থেকে ভিন্ন। এই খ্রিস্টানরা একদিন ইহুদিদের সঙ্গে জোট বা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। কোরআন মুসলিমদেরকে শুধু এমন খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা জোট বন্ধ করতে নির্দেশ দেয়নি, যারা ইহুদিদের সঙ্গে জোট গঠন করে—অর্থাৎ একটি ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের অংশ হয়ে যায়—বরং ঘোষণা করেছে যে, এই ধরনের মুসলমানরাও সেই জোটের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এর ফলে, তারা মুসলিম হিসেবে তাদের ধর্মীয় পরিচয় হারাবে (সূরা মায়েদা, ৫:৫১)।

ফলে, যখন ফেরেশতারা কবরের প্রশ্ন করতে আসবেন, তারা অবাক ও হতাশ হয়ে দেখবে যে এই ব্যক্তিদের মুসলিম হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারা সেই ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের বন্ধু ও অংশ হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করা হবে।

চলুন, এখন আমরা সেই দুটি খ্রিস্টান শিবিরের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি, যারা এখন বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা পশ্চিমের সাথে যুদ্ধ চায় না এবং পশ্চিমা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেনি। তবে অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা এটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা যুদ্ধকে ভয়

পায় না - এমনকি যদি তা পারমাণবিক যুদ্ধও হয়। এটি পশ্চিমা শিবিরই যারা অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করেছে এবং এখন অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধের জন্য আগ্রহী; আর পশ্চিমারা সবসময় প্রতারণা এবং পাহাড় প্রমাণ মিথ্যা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছে।

এই দুটি খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের আলাদা করে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইহুদি এবং ইহুদি জায়নবাদী আন্দোলনের সাথে তাদের সম্পর্ক। যেখানে পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদিদের যিশুকে (আলাইহিস সালাম) মসিহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার দাবিতে ইহুদিদের ভূমিকার বিষয়ে ইহুদি ধর্মের সাথে আপস করেছে, এবং একটি ইহুদি-খ্রিস্টান জায়নবাদী জোট প্রতিষ্ঠা করেছে যা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন দেয়, সেখানে অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্ব সেই পথে যায়নি। এর পরিবর্তে, তারা জেরুজালেমের উপর ইহুদিদের একচেটিয়া দাবির বিরোধিতা করে। প্রায় সমগ্র অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্ব জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। এখানে জেরুজালেমের সমস্ত খ্রিস্টান চার্চের প্রধানদের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লেখা চিঠির একটি অংশ দেওয়া হলো। এটি জেরুজালেমকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মার্কিন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে লেখা হয়েছিল।

জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক এবং স্থানীয় চার্চসমূহের প্রধানগণ

সম্মানিত ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।

৬ই ডিসেম্বর, ২০১৭

প্রিয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং প্রশংসা করি যে এই দিনগুলিতে আপনি জেরুজালেমের মর্যাদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। আমরা সতর্কতার সাথে এটি পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমরা মনে করি আপনার সমীপে এই চিঠিটি লেখা আমাদের কর্তব্য।

২০০০ সালের ১৭ই জুলাই, আমরা জেরুজালেমের মর্যাদা নির্ধারণের জন্য ক্যাম্প ডেভিডে মিলিত নেতাদের কাছে অনুরূপ একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তারা সদয়ভাবে আমাদের চিঠিটি বিবেচনায় নিয়েছিলেন। আজ, মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আপনিও জেরুজালেমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করবেন।

আমাদের ভূমি শান্তির ভূমি হিসাবে পরিচিত। জেরুজালেম, ঈশ্বরের শহর, আমাদের এবং বিশ্বের জন্য শান্তির শহর। দুর্ভাগ্যবশত, পবিত্র শহর জেরুজালেমসহ আমাদের পবিত্র ভূমি আজ সংঘাতের ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

যারা জেরুজালেমকে ভালোবাসেন, তাদের সকলেরই ইচ্ছা এই শহরকে এর সকল বাসিন্দাদের জন্য শান্তি, জীবন ও মর্যাদার ভূমি ও শহরে পরিণত করার জন্য কাজ করা। এর সকল বিশ্বাসীর প্রার্থনা এই শহরের অন্তর্গত তিন ধর্ম ও দুই জনগোষ্ঠীর ঈশ্বরের কাছে উঠে আসে এবং শান্তির প্রার্থনা করে, যেমন গীতরচয়িতা বলেছেন: ″আমাদের কাছে ফিরে আসুন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখুন!″ (৮০. ১৪)। আমাদের নেতাদের অনুপ্রাণিত করুন, এবং তাদের মন ও হৃদয়কে ন্যায়বিচার ও শান্তিতে পূর্ণ করুন।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আমরা উদ্বেগ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেরুজালেমের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে এমন খবর। আমরা নিশ্চিত যে এই ধরনের পদক্ষেপ জেরুজালেম এবং পবিত্র ভূমিতে ঘৃণা, সংঘাত সহিংসতা এবং দুর্ভোগ বাড়াবে, যা আমাদের ঐক্যের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং ধ্বংসাত্মক বিভেদের দিকে আরও গভীরে ঠেলে দেবে। আমরা আপনার কাছে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আবেদন জানাচ্ছি যে আমাদের সকলকে আরও ভালোবাসা এবং একটি চূড়ান্ত শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন, ।

আমাদের আন্তরিক পরামর্শ এবং মিনতি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন জেরুজালেমের বর্তমান আন্তর্জাতিক মর্যাদা বজায় রাখে। যেকোনো আকস্মিক পরিবর্তন অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, আমাদের বন্ধুদের দৃঢ় সমর্থন নিয়ে, ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিরা একটি টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি আলোচনার দিকে কাজ করতে পারে, যা পবিত্র শহর জেরুজালেমকে তার নিয়তি পূরণ করার জন্য যারা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের সকলের উপকার করবে। একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যদি এর মধ্যে বসবাসকারী সকল মানুষের হৃদয়কে সংঘাত এবং ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে, তবে পবিত্র শহরটি সকলের দ্বারা ভাগ করে নেওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা যেতে পারে।

শীঘ্রই বড়দিন আসছে। এটি শান্তির উৎসব। ফেরেশতারা আমাদের আকাশে গেয়েছেন: ″সর্বোচ্চ স্থানে ঈশ্বরের মহিমা, এবং পৃথিবীতে সদিচ্ছার মানুষের প্রতি শান্তি।″এই আসন্ন বড়দিনে, আমরা জেরুজালেমকে শান্তি থেকে বঞ্চিত না করার জন্য মিনতি করছি, আমরা আপনাকে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি, ফেরেশতাদের গান শুনতে আমাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছি। জেরুজালেমের খ্রিস্টান নেতা হিসেবে, আমরা আপনাকে আশা নিয়ে আমাদের সাথে চলার আমন্ত্রণ জানাই, যখন আমরা এই অনন্য ও পবিত্র শহরের সকল মানুষের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।

আমাদের শুভকামনা এবং বড়দিনের শুভেচ্ছা,

জেরুজালেমের চার্চসমূহের প্যাট্রিয়ার্ক ও প্রধানগণ:

প্যাট্রিয়ার্ক থেওফিলোস তৃতীয়, গ্রিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কেট

প্যাট্রিয়ার্ক নোরহান মানুগিয়ান, আর্মেনিয়ান অ্যাপোস্টলিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কেট

আর্চবিশপ পিয়েরবাটিস্টা পিজ্জাবাল্লা, অ্যাপোস্টলিক প্রশাসক, ল্যাটিন প্যাট্রিয়ার্কেট

ফাদার ফ্রান্সেস্কো প্যাটোন, ও. এফ. এম. , পবিত্র ভূমির তত্ত্বাবধায়ক

আর্চবিশপ আনবা অ্যান্টোনিয়াস, কপটিক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কেট, জেরুজালেম

আর্চবিশপ স্বেরিওস মালকি মুরাদ, সিরিয়ান অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কেট

আর্চবিশপ আবা এমবাকোব, ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কেট

আর্চবিশপ জোসেফ-জুলস জেরে, গ্রিক-মেলকাইট-ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্কেট

আর্চবিশপ মোসা এল-হাগ, ম্যারোনাইট প্যাট্রিয়ার্কাল এক্সারকেট

জেরুজালেম ও মধ্যপ্রাচ্যের এপিস্কোপাল চার্চের আর্চবিশপ সুহেইল দাওয়ানি

বিশপ মুনিব ইউনান, জর্ডান ও পবিত্র ভূমির ইভানজেলিকাল লুথেরান চার্চ

বিশপ পিয়ের মালকি, সিরিয়ান ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্কাল এক্সারকেট

মনসিওর জর্জেস ডানকায়ে, আর্মেনিয়ান ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্কাল এক্সারকেট

একমাত্র অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা যারা আমেরিকান সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেনি, তারা হলো যারা ন্যাটোতে যোগ দিয়েছিল।

দুই শিবিরের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো পশ্চিমা শিবিরের নৈতিক, সামাজিক ও আইনিভাবে নারীবাদী বিপ্লবকে গ্রহণ করা, যা অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্ব তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিমা খ্রিস্টানরা ক্রমাগত একটি নারীবাদী এজেন্ডা প্রচার করে, যা একজন পুরুষের পক্ষে অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করা এবং বিয়ের সার্টিফিকেট পাওয়াকে বৈধ করে তোলে। তারা ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে নিষিদ্ধ করে, অথচ বিয়ের আগে লিভ-ইন সম্পর্ক এবং এর ফলস্বরূপ কুমারীত্ব হারানোকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা তাদের পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমকামী

এজেন্ডাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এটিকে প্রভু–ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ঈশ্বরনিন্দা/ ধর্মদ্রোহিতা এর সবচেয়ে দৃশ্যমান লক্ষণ বলে মনে করে। ইসলামে এই ধর্মদ্রোহিতা–এর পরিভাষা হলো ’কুফর’।নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছিলেন যে, কাফির’ (অবিশ্বাসী) শব্দটি দাজ্জালের কপালে লেখা থাকবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকা পশ্চিমা খ্রিস্টান শিবিরের মানবজাতির উপর পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মুদ্রাভিত্তিক, সামরিক ইত্যাদি চাপিয়ে দেওয়ার একটি অহংকারী এজেন্ডা রয়েছে, অন্যদিকে রাশিয়ার নেতৃত্বে থাকা বর্তমান অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের এমন কোনো সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা নেই। এটা অবশ্য সত্য যে, যখন রাশিয়া কিছু জার সম্রাটের অধীনে ছিল, তখন এটি নিঃসন্দেহে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু আজকের রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটি সত্য নয়।

পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছে। এর ফলে, ধর্ম তাদের প্রাথমিক পরিচয় নয়। বরং এখন তাদের জাতীয় পরিচয় ধর্মের জায়গা নিয়েছে।

অন্যদিকে, অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা এতটা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তাই তাদের প্রধান পরিচয় এখনও তাদের খ্রিস্টান বিশ্বাস।

অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বে ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বজায় রাখা হয়েছে। এর ফলে, যাজকত্ব এবং মঠ জীবন এখনও অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে, পশ্চিমা খ্রিস্টান সমাজে ধর্ম এবং ধর্মীয় জীবনযাপন ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্মে মঠ জীবন প্রায় বিলুপ্তের পথে, যেখানে গির্জা ও মঠগুলো ক্রমশ ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার দোকান বা অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজে বিক্রি হচ্ছে, অথবা মুসলমানদের কাছে মসজিদ বা ইসলামিক স্কুলে রূপান্তরের জন্য বিক্রি হচ্ছে।

এটি অদ্ভুতভাবে স্পষ্ট যে, কুরআন যখন বলেছে যে এমন কিছু খ্রিস্টান থাকবে যারা মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হবে, তখন এটি অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের প্রতি ইঙ্গিত করছিল।

আর যখন কুরআন মুসলিমদেরকে নির্দিষ্ট কিছু খ্রিস্টান ও ইহুদির সঙ্গে বন্ধুত্ব বা জোট বজায় রাখতে নিষেধ করেছিল, তখন এটি পশ্চিমা খ্রিস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করছিল।

যারা এই কুরআনের ব্যাখ্যা মিথ্যা বলে গোঁয়ার্তুমি দেখায় এবং উপরের ব্যাখ্যার বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না, তাদের বক্তব্যকে অনর্থক বিবেচনা করে উপেক্ষা করা উচিত।

“শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের ইতিহাস”

এই দুই শিবিরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। বরং, এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদ্যমান।

এটি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়েছিল, যখন পশ্চিমা খ্রিস্টানরা মুসলিম শাসন থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছিল। ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপল, যা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের রাজধানী, তার উপর আক্রমণ চালায় এবং চতুর্থ ক্রুসেডে এটি জয় করে। তারা কয়েক দশক ধরে শহরটি শাসন করেছিল, যতক্ষণ না অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা তাদের পরাজিত করে এবং রাজধানী শহরকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

পশ্চিমা খ্রিস্টানদের প্রতি অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের হৃদয়ে প্রত্যাখ্যান ও তিক্ততার মাত্রা সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে দেখা যায়, যখন কনস্টান্টিনোপল উসমানীয় তথাকথিত ইসলামিক সাম্রাজ্যের হাত ধরে অবরুদ্ধ হয় এবং মুসলিমদের হাতে পতনের মুখে ছিল। অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা সাহায্যের জন্য পশ্চিমের দিকে তাকায়।

ভ্যাটিকান পশ্চিমা সামরিক হস্তক্ষেপের একটি শর্ত দেয়, যা কনস্টান্টিনোপলকে রক্ষা করতে পারত। শর্তটি ছিলঅর্থোডক্স খ্রিস্টানদের তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে ধর্মীয়ভাবে পশ্চিমের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।

অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের প্রতিক্রিয়া আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে:
“কার্ডিনালের টুপির চেয়ে মুসলিমের পাগড়ি ভালো!”

অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা উসমানীয়দের কাছে পরাজয় মেনে নিলেও, পশ্চিমা খ্রিস্টানদের শর্ত মেনে তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করতে চায়নি।

এমন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে পশ্চিমা খ্রিস্টানরা অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে সহযোগিতা করেছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্য কেবল কনস্টান্টিনোপল জয় করে অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বকে তাদের রাজধানী শহর থেকে বঞ্চিতই করেনি, বরং গোদের উপর বিষফোঁড়ার’ মতো করে অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাথেড্রাল, হাগিয়া সোফিয়া, দখল করে নেয় এবং কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে এটিকে পাপপূর্ণভাবে মসজিদে রূপান্তরিত করে, যেখানে মুসলিমদেরকে এমন উপাসনালয় রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। উসমানীয়রা অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছিল যতক্ষণ না তারা ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতে সফল হয় এবং এর মাধ্যমে অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়াকে কৃষ্ণ সাগরে সামরিক উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করে।

অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়া কেবল পশ্চিম এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য উভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তাই নয়, বরং রাশিয়ার উপর শাসনকারী পশ্চিমা-পন্থী জাররা রাশিয়াকে অর্থোডক্স খ্রিস্ট ধর্ম থেকে সরিয়ে পশ্চিমের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করেছিল। তারা সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের নামে বিশাল যুদ্ধ শুরু করার সময় মুসলিমদেরকেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছিল। জারবাদী রাশিয়ার এমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ মুসলিম প্রতিরোধ, বর্বর জারবাদী রাশিয়ার নিপীড়নের শিকার মুসলিমদের স্মৃতিতে আজও অম্লান রয়েছে এবং এটি আজও রাশিয়ার প্রতি ঘৃণার আগুনকে উসকে দিতে সাহায্য করে। মুসলিমরা সম্ভবত কখনোই বুঝতে পারেনি যে অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়াকে সেই জারদের পাপের জন্য দায়ী করা উচিত নয়, যাদেরকে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু দ্বারা রাশিয়ার উপর চাপানো হয়েছিল। এই জাররা ঠিক এই কারণেই পশ্চিমের কাছে "মহান" হিসেবে পরিচিত, কারণ তারা অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়ার স্বার্থের চেয়ে পশ্চিমা খ্রিস্টানদের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের জারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন পিটার দ্য গ্রেট এবং ক্যাথরিন দ্য গ্রেট।

যখন অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়া উসমানীয়দের পরাজিত করে ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হয়, তখন পশ্চিমা খ্রিস্টান দেশগুলো ১৮৫৩-৫৫ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু করে, যাতে রাশিয়াকে ক্রিমিয়ায় সামরিক উপস্থিতি স্থাপন এবং কৃষ্ণ সাগরে প্রভাব বিস্তার থেকে বাধা দেওয়া যায়।

তবে, পশ্চিমা খ্রিস্টানদের এই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই রাশিয়া ক্রিমিয়ায় তাদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং পশ্চিমের আরোপিত সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিতে সক্ষম হয়।

রাশিয়ার উপর শতাব্দীব্যাপী আক্রমণ এবং এর ফলে অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের উপর পশ্চিমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'সাফল্য' ছিল ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব, যা রাশিয়ায় এমন এক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনে যে জার নিকোলাসের শাসনের অবসান ঘটে।

জার নিকোলাস খ্রিস্টান ধর্মকে সংরক্ষণ এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তার স্থলে একটি নাস্তিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা শুধু অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের মুক্ত ও অবাধ বাজারকে ধ্বংস করেই থেমে থাকেনি, বরং অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্ম ও চার্চের বিরুদ্ধে নির্দয় যুদ্ধও চালিয়েছে।এমনকি জার্মানির আত্মসমর্পণের পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়ার পরও, পশ্চিমারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দিয়েছিল, যতক্ষণ না তারা অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের সেই অংশগুলোর সামরিক নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়, যা তখনও জয় করা হয়নি।

১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ক্রিমিয়াকে রাশিয়া থেকে কেড়ে নিয়ে ইউক্রেনের হাতে (মধ্যরাতে) তুলে দিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। বরং, এটি অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমের শতাব্দীব্যাপী অবিরাম যুদ্ধেরই ধারাবাহিকতা ছিল। যখন রাশিয়া ২০১৪ সালের প্রথম দিকে সফলভাবে ক্রিমিয়াকে তার নিজস্ব অঞ্চল হিসেবে পুনরুদ্ধার করে

এবং কৃষ্ণ সাগরে তার সামরিক উপস্থিতি ফিরিয়ে আনে, তখন এর অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল যে অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়ার উপর আরও একটি পশ্চিমা খ্রিস্টান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সেই যুদ্ধই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

রাশিয়া এবং এর মাধ্যমে অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের বিরুদ্ধে আসন্ন মহাযুদ্ধ একটি প্রতিকূল সামরিক ও ধর্মীয় প্রোফাইলের অংশ, যা হাজার বছরেরও বেশি আগে রোম কনস্টান্টিনোপল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্মে বিদ্যমান রয়েছে। তবে এই আসন্ন মহাযুদ্ধ পূর্বের সমস্ত যুদ্ধ থেকে ভিন্ন, কারণ এটি নিঃসন্দেহে মানব ইতিহাসে সংঘটিত সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হতে চলেছে। এটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হওয়ারও হুমকি দিচ্ছে, কারণ এতে যে পারমাণবিক অস্ত্র এবং অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, সেগুলোর উভয় যুদ্ধরত পক্ষকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্বকে সতর্ক করে বলেছিলেন:
“পারমাণবিক রাশিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করো না!”

সুতরাং, আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে রাশিয়া তাদের বা তাদের মিত্র সিরিয়ার উপর যেকোনো পশ্চিমা খ্রিস্টান সামরিক আক্রমণের জবাবে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্বিধা করবে না; এমনকি রাশিয়া জানলেও যে পারমাণবিক যুদ্ধ উভয় পক্ষকেই ধ্বংস করে দেবে, তবুও তারা এই পদক্ষেপ নেবে।

আসন্ন মহাযুদ্ধটি সামরিক ইতিহাসে একটি অনন্য যুদ্ধ হবে। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে ফিরে তাকাই, যিনি এমন একটি অনন্য যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

শেষ যুগে সংঘটিত এক মহাযুদ্ধ সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ(সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, যেখানে ৯৯% যোদ্ধা নিহত হবে। এটি একটি অনন্য যুদ্ধ হবে, কারণ ইতিহাসে এমন কোনো যুদ্ধ ঘটেনি যেখানে ৯৯% যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে যা অত্যন্ত অদ্ভুত তা হলো এটি এমন পরিস্থিতিতেও লড়া হবে, যখন সকল যোদ্ধাই জানবে যে খুব কম লোকেই এই যুদ্ধে বেঁচে থাকবে। এটি বরকতময় নবীর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে স্পষ্ট যে, প্রত্যেক যোদ্ধা বলবে: "আমরাই বেঁচে থাকব।"

পাঠকদের জন্য এটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এমন একটি যুদ্ধ গণবিধ্বংসী অস্ত্র, যেমন পারমাণবিক এবং তাপ-পারমাণবিক (থার্মো-নিউক্লিয়ার) অস্ত্র যা আগে কখনো যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি।

যে মহাযুদ্ধ আসছে, তা ঠিক এমনই একটি যুদ্ধ হবে।
যেহেতু সেই যুদ্ধ এখন এতটাই সন্নিকটে যে যেকোনো সময় ঘটতে পারে, তাই আমাদের পাঠকদের জিজ্ঞাসা করা ন্যায্য যে—

স্বর্ণের পাহাড় এখনও নদী থেকে কেন আবির্ভূত হয়নি?

নবী (সাঃ) প্রকাশ করেছেন যে ইউফ্রেটিস নদী থেকে একটি স্বর্ণের পাহাড় উন্মোচিত হওয়ার কারণে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং সেই স্বর্ণের জন্যই যুদ্ধ হবে। তবে তিনি বিশ্বাসীদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তারা যেন সেই স্বর্ণ স্পর্শ না করে।

যাদের চিন্তা করার সামান্যতম ক্ষমতাও আছে, তাদের কাছেও এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, ইউফ্রেটিস নদী সেই স্বর্ণের পাহাড় উন্মোচন না করা পর্যন্ত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে না।

কুরআনে এক ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে

যারা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) –কে অনুসরণ করে, তারা তাদের উপর বিজয়ী হবে যারা তাঁকে অস্বীকার করে।

কুরআনে দুই খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মহাযুদ্ধের ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।
এক পক্ষ বিশ্বস্তভাবে খ্রিস্টধর্ম অনুসরণের চেষ্টা করে,
অন্য পক্ষ কুফরের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

এখানে কুরআনের সেই আয়াতটি উপস্থাপন করা হলো,
যা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত এক ঘটনাকে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করেছে,
যা অবশ্যই ইতিহাসের সমাপ্তির আগে সংঘটিত হবে।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

সূরাঃ আলে–ইমরান ৩:৫৫/৫৭

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন: 'হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পুরোপুরি গ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব; আর যারা কুফরি করে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমাকে অনুসরণ করবে, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর বিজয় দেব যারা কুফরি করে। পরিশেষে, তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেবো (৩:৫৫)। আর যারা সত্যকে অস্বীকার করার জন্য বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আমি এই দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি দেবো, এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না (৩:৫৬); পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তিনি পূর্ণ প্রতিদান দেবেন: কারণ আল্লাহ অন্যায়কারীদের ভালোবাসেন না (৩:৫৭)।'"

কুরআনের উপরের এই অংশে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের সমর্থনে কোনো ঐশ্বরিক ঘোষণা নেই, কারণ তারা ঈসা (আঃ) এর অনুসারী নন। বরং এটি এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত যাদের কাছে ঈসা (আঃ) কে পাঠানো হয়েছিল। তারা কারা?

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.

এবং তিনি ছিলেন ইস্রায়েল জাতির প্রতি প্রেরিত একজন রাসূল

সূরাঃ আলে–ইমরান ৪৯

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم

“এবং যখন ঈসা, মরিয়মের পুত্র, বললেন: হে বনি ইস্রায়েল! আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রেরিত একজন রাসূল।”

সূরাঃ আস–সফ আয়াত ৬

কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) কে বনী ইসরাইল জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল; সুতরাং তাঁর অনুসরণ করার আদেশও তাদের জন্যই ছিল, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)–এর অনুসারীদের জন্য নয়।

সুতরাং, উপরে উদ্ধৃত ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী (আলে ইমরান, ৩:৫৫–৫৭) এমন একটি ঘটনার সংবাদ দিয়েছে যা তাদের মধ্যে ঘটবে, যাদের কাছে ঈসা (আঃ) পাঠানো হয়েছিল, অর্থাৎ ইসরায়েলীরা, যারা আহলে কিতাব নামেও পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, যারা ঈসা (আঃ)–কে গ্রহণ করবে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁর অনুসরণ করবে, তাদের প্রতি এমন ঐশ্বরিক সাহায্য বর্ষিত হবে যে, ইতিহাসের সমাপ্তি পর্যন্ত তা তাদের সহায়ক হবে। এই সাহায্যের মাধ্যমে তারা ঈসা (আঃ) এবং তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন তা রক্ষা করবে এবং যারা কুফর বা অবিশ্বাস করে, তাদের উপর জয়লাভ ও কর্তৃত্ব স্থাপন করবে।

সর্বপ্রথম আমরা বুঝতে পারছি যে, যখন আয়াতটি ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কথা বলেছে, তখন তা তাদের বোঝানো হয়েছে যারা তাঁকে মসীহ হিসেবে গ্রহণ করেছে; অর্থাৎ, খ্রিস্টান বিশ্ব। অন্যদিকে, আয়াতে যাদেরকে কুফরকারী জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো যারা ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আজও তা করছে; অর্থাৎ, ইহুদি বিশ্ব।

অতএব, কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জানাচ্ছে যে, ইতিহাসের সমাপ্তির আগে খ্রিস্টানরা শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদেরকে বশীভূত করবে, একই সাথে ইসরায়েলের ইহুদি রাষ্ট্রও। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা ঈসা (আঃ)-কে অনুসরণকারী খ্রিস্টানদের সঙ্গে নেই; কারণ তারা বর্তমানে ইহুদি এবং ইসরায়েলের ইহুদি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমর্থক।

এটি থেকে একটি অন্তর্নিহিত অর্থ পাওয়া যায় যে, ঐ উল্লিখিত খ্রিস্টানরা অবশ্যই সেই অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্ব হবে, যার নেতৃত্বে রয়েছে রাশিয়া। অন্যদিকে, পশ্চিমা খ্রিস্টানরা প্রকাশ্য কুফরের অবস্থায় রয়েছে, কারণ তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ এবং বৈধ বিবাহ সনদ প্রাপ্তির মতো দুষ্ট এজেন্ডা প্রচার করছে।এই ধরনের খ্রিস্টানরা এখন সেই ইহুদিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যারা ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে

প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং ইতিহাসের সমাপ্তির আগে, তারা ঈসা (আঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারীদের দ্বারা পরাজিত ও বশীভূত হবে।

কুরআন ঘোষণা করেছে যে’ রুম’ দুবার বিজয়ী হবে।

কুরআন ‘রুম’ নামক একটি জাতিকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখিয়েছে যে, কিতাবের একটি অধ্যায়ের নাম তাদের নামে রাখা হয়েছে: সূরা আর-রুম। রুম একটি সেনাবাহিনী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হবে, কারণ কুরআন নিশ্চিত করেছে যে তারা নিকটবর্তী কোনো ভূমিতে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তুকুরআন এরপর নাটকীয়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, রুম মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করবে।

الٓمٓ

غُلِبَتِ الرُّومُ

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

আলিফ লাম মিম। রুম পরাজিত হয়েছে। পরাজয় ঘটে নিকটবর্তী কোনো ভূমিতে; কিন্তু এদের পরাজয়ের পরও তারা শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় আসবে; কারণ রুমের বিজয় নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ, পূর্বেও এবং পরেও। সেই দিনে যারা এই কোরআনে বিশ্বাসী, তারা সেই বিজয় দেখে আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে চান সাহায্য করেন। তিনি মহিমান্বিত, দয়ালু।এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। তারা পৃথিবীর জীবনের কিছু অংশই বোঝে, কিন্তু পরকালের ব্যাপারে তারা উদাসীন।

সূরা আর-রুম (৩০:১-৭)

যখন কুরআন উপরে 'রুম' এর কথা উল্লেখ করেছে, তখন তা অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল–ভিত্তিক বাইজেন্টাইন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে, যারা সিরিয়ায় পারস্য (জরথুস্ত্রবাদী) সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল। আর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল যখন তারা কয়েক বছরের মধ্যে পারস্যদের পরাজিত করেছিল। কুরআনের ভাষ্যকার **মুহাম্মদ আসাদ** 'রুম' এর পরাজয় এবং পরবর্তী বিজয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন:

উপরে উল্লেখিত রুমের পরাজয় ও বিজয় বাইজেন্টাইন এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে শতাব্দীর দীর্ঘ সংঘাতের শেষ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে পারস্যরা সিরিয়া এবং আনাতোলিয়ার কিছু অংশ দখল করে, যা "নিকটবর্তী ভূমি" হিসেবে উল্লেখিত অর্থাৎ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি।

৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তারা দামেস্ক দখল করে, এবং ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম। মিশরও তাদের হাতে পতিত হয় ৬১৫–৬১৬ খ্রিস্টাব্দে, এবং একই সময়ে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করা হয়। এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় হিজরতের প্রায় সাত বছর আগে, অর্থাৎ খ্রিস্টান যুগের ৬১৫ বা ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল।

নবীর আশেপাশের অল্পসংখ্যক মুসলিম হতাশ হয়ে পড়েছিল, কারণ তারা খ্রিস্টান ছিল এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। অন্যদিকে, মূর্তিপূজক কুরাইশরা পারস্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, মনে করে তারা মুসলিমদের বিরোধিতায় সহায়ক হবে।

যখন মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের উপরের আয়াত আবৃত্তি করে "কয়েক বছরের মধ্যে" বাইজেন্টাইন বিজয়ের কথা বললেন, তখন কুরাইশরা উপহাস করেছিল। কুরআনের 'বিদ' শব্দটি সাধারণত "কিছু" অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা তিন থেকে দশের মধ্যে যেকোনো সংখ্যা বোঝায়।

যেমনটি ঘটেছিল, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর ছয় বা সাত বছর পরে বাইজেন্টাইনদের অনুকূলে মোড় নেয়। সম্রাট হেরাক্লিয়াস পার্বতমালা দক্ষিণে ইসুসে পারস্যদের পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং পরে তাদের এশিয়া মাইনর থেকে বিতাড়িত করেন। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ পারস্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৬২৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শুরুতে পারস্য সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

যদি শেষ সময়ে, অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে, 'রুম' পুনরায় বিজয়ী হয় এবং সেই বিজয় আল্লাহর সাহায্যের ফলস্বরূপ আসে, তবে আমাদের অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে কোন খ্রিস্টানগোষ্ঠী আল্লাহর সেই সাহায্যের যোগ্য হবে এবং ফলত বিজয় অর্জন করবে?

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল একটি কনস্টান্টিনোপলভিত্তিক পূর্ব খ্রিস্টান বিশ্ব (Eastern Orthodox Church), এবং অন্যটি রোমভিত্তিক পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্ব (Roman Catholic Church)। এই বিভাজনের ফলেই এখন দুটি ভিন্ন খ্রিস্টান ঐতিহ্য রয়েছে একটি পূর্বে, অন্যটি পশ্চিমে।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা পশ্চিমের ‘রূম’ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই সভ্যতা এতটাই ধর্মদ্রোহী ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত যে, তারা ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা ও ঈশ্বরের বিধান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েছে। আজ তারা এমন এক সংস্কৃতি প্রচার করছে যেখানে পুরুষে পুরুষে বিবাহ, এবং সেই অশুভ সম্পর্ককে বৈধ বিবাহ সনদ প্রদানের মতো দুষ্ট এজেন্ডা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

অতএব, আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য ‘রূম’ কখনোই এই পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্ব হতে পারে না।

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি (কুরআন, রূম, ৩০:১-৭; আলে ইমরান, ৩:৫৫) অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যারা অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়া দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং, শীঘ্রই সংঘটিত হতে যাওয়া মহাযুদ্ধে রাশিয়া বিজয়ী হবে।

এই সিদ্ধান্তটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয় যে, মহাযুদ্ধের পরই এক মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে কনস্টান্টিনোপল বিজয় সংঘটিত হবে। অন্য কথায়, মহাযুদ্ধের ফলাফলই কনস্টান্টিনোপল বিজয়কে সম্ভব করে তুলবে; অতএব, এটি অনুমান করা কঠিন নয় যে সেই মহাযুদ্ধে ন্যাটো পরাজিত হবে।

মহাযুদ্ধের প্রভাব ও পরিণতি

ইসলামের শেষ জামানার ভবিষ্যদ্বাণী আমাদেরকে ইঙ্গিত দেয় মহাযুদ্ধের পরেও পৃথিবীর অন্তত কিছু অংশে জীবনের ধারাবাহিকতার দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ দেয়।

মহাযুদ্ধের পর শুধু একটি মুসলিম বাহিনীই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে না এবং ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে উসমানীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক সংঘটিত কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর থেকে বোসফরাসের উপর পশ্চিমের যে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা ভেঙে দেবে; বরং ওই শহর বিজয়ের পরেই দাজ্জাল বাস্তবে আবির্ভূত হবে। সে নিজেকে সত্যিকারের মসীহ বলে মিথ্যা দাবি করে ইসরায়েল রাষ্ট্র শাসন করবে।

যদিও এই প্রবন্ধে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলির একটি বিস্তারিত ইসলামিক ইস্কেটোলজি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি, তবুও আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই শহর বিজয়ের ফলস্বরূপ ইসলামের যারা কুরআনের প্রতি বিশ্বস্ত তারা হাগিয়া সোফিয়া ক্যাথেড্রাল কে অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে। প্রকৃতপক্ষে, বিজয়ী উসমানীয় সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ কর্তৃক লজ্জাজনক, অসম্মানজনক ও পাপপূর্ণভাবে মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া সেই ঐতিহাসিক ক্যাথেড্রালকে অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া, ঈসা (আঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারীদের ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারীদের মধ্যে এক দৃঢ় জোটকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এই সময়েই কুরআনের একটি কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে এবং উসমানীয় তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের সেই বধির, মূক ও অন্ধ কট্টর সমর্থকরা তা প্রতিরোধে কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে ভবিষ্যতে একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হবে। এই প্রবন্ধের উপসংহার হলো অর্থোডক্স খ্রিস্টান বিশ্বই কুরআনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবে, প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, যা এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষ-যামানার সেই বন্ধুত্ব ও জোটকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الۡيَهُوۡدَ وَ الَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ اَقۡرَبَهُمۡ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيۡسِيۡنَ وَ رُهۡبَانًا وَّ اَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ

"তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে, মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় সবচেয়ে কঠোর হলো ইহুদী ও মুশরিকরা; এবং তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে, মুমিনদের প্রতি ভালোবাসায় সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো তারা যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান।' এর কারণ হলো, তাদের মধ্যে আলেম (যাজক) ও দরবেশ (সন্ন্যাসী) রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না।"

সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৮২

আশা ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা এবং মুক্তির আয়াতসমূহ

কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য এমন একটি প্রার্থনা দিয়েছে যা মহাযুদ্ধের সময় সুরক্ষা ও মুক্তির জন্য পাঠ করা উচিত।

رَبَّنَا اكۡشِفۡ عَنَّا الۡعَذَابَ اِنَّا مُؤۡمِنُوۡنَ

তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব।

সূরা আদ-দুখান ৪৪:১২

এটি এমন আয়াত প্রদান করেছে যা বিশ্বাসীদের হৃদয়ে আশা জাগায়, যাতে তারা ভয়ে আচ্ছন্ন না হয় এবং হতাশায় নিমজ্জিত না হয়:

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, ‘নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক’!

সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ

অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ। কোন মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

সূরা আলে ইমরান৩:১৭৪

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

এ লোকেরা হচ্ছে শয়ত্বান; তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর,যদি তোমরা মু’মিন হও।

সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৫

ইমরান নজর হোসেইনের বইসমূহ:

১. আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম
২. কুরআন ও সুন্নাহতে রিবা (সুদ) এর নিষেধাজ্ঞা
৩. ইসলামে রিবা (সুদ) নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব
৪. এক জামাত এক আমির: ফিতনার যুগে একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠন
৫. ইব্রাহিমের ধর্ম এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র - কুরআনের দৃষ্টিকোণ
৬. ইসরা ও মিরাজের কৌশলগত গুরুত্ব
৭. ইসলামে স্বপ্ন ও দর্শনের কৌশলগত গুরুত্ব
৮. খিলাফত, হেজাজ এবং সৌদি-ওয়াহাবি জাতি-রাষ্ট্র
৯. রোজা ও ক্ষমতা
১০. মদ্যপান ও মাদকাসক্তি নিরাময়ের কুরআনিক পদ্ধতি
১১. জর্জ বার্নার্ড শ এবং ইসলামিক পণ্ডিত
১২. আমেরিকায় ৯/১১হামলার প্রতি একটি মুসলিম প্রতিক্রিয়া
১৩. কুরআনে জেরুজালেম
১৪. সূরা আল-কাহফ: মূলপাঠ, অনুবাদ ও ভাষ্য
১৫. সূরা আল-কাহফ ও আধুনিক যুগ
১৬. আধুনিক বিশ্বে শেষ দিবসের নিদর্শনসমূহ
১৭. স্বর্ণ দিনার ও রৌপ্য দিরহাম - ইসলাম ও অর্থের ভবিষ্যৎ
১৮. ইসলামী ভ্রমণকাহিনী
১৯. আধুনিক বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে একটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
২০. ইসরায়েলের রহস্যময় সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডার ব্যাখ্যা
২১. ইকবাল ও পাকিস্তানের চরম সত্যের মুহূর্ত
২২. আখিরুজ্জামান-এ মদিনার কেন্দ্রীয় অবস্থানে প্রত্যাবর্তন
২৩. আখিরুজ্জামান-এ খিযিরের পদচিহ্ন অনুসন্ধানে
২৪. কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি
২৫. দাজ্জাল, কুরআন ও আওয়ালুজ্জামান (প্রথম সময়)
২৬. কুরআন, মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম
২৭. কুরআন ও রাশিয়ার নিয়তি
২৮. কুরআন, দাজ্জাল এবং জাসসাদ
২৯. কুরআনে কনস্টান্টিনোপল